পুস্তক পর্যালোচনা

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

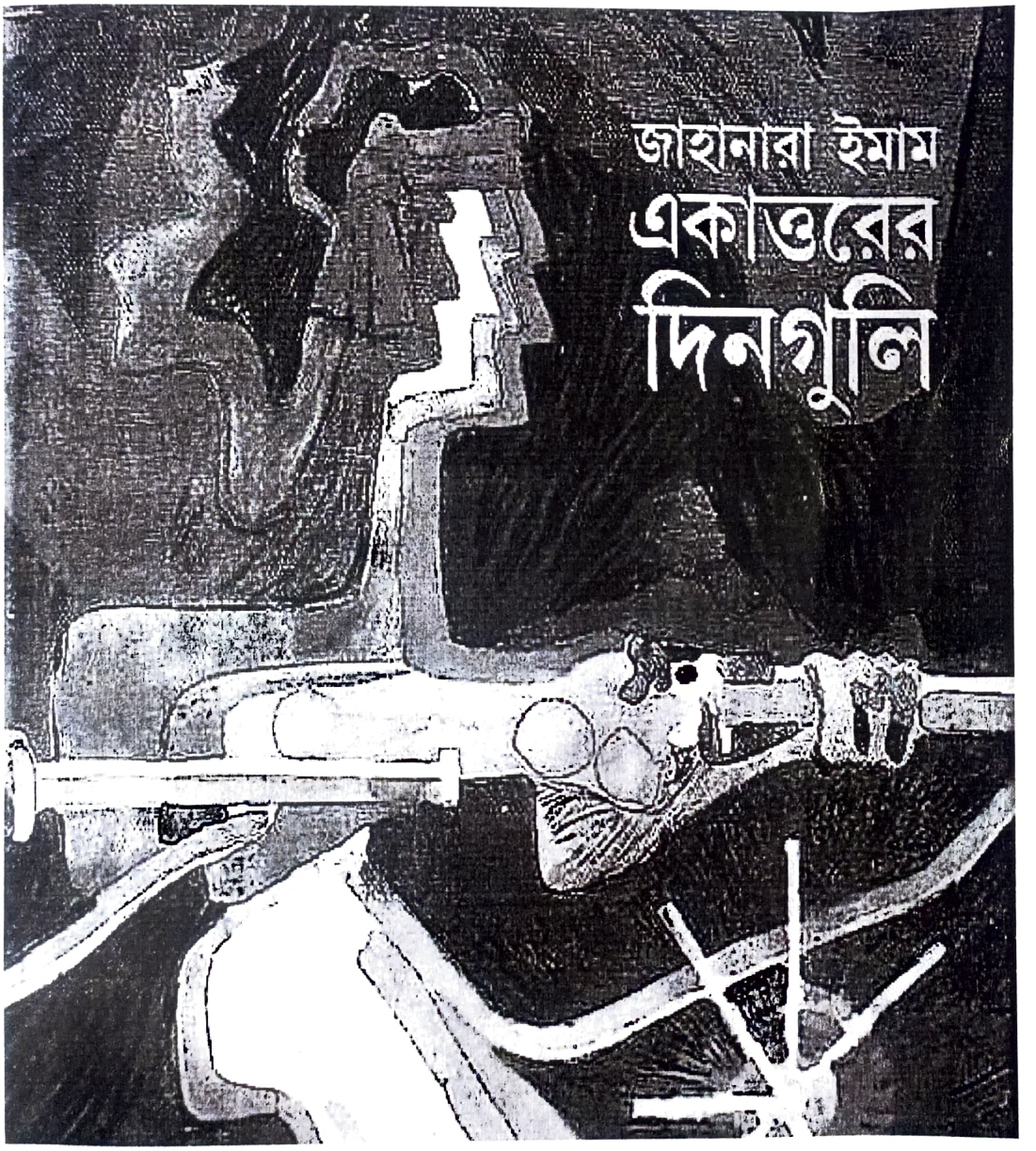

ROLL-40

পর্যালোচনায়

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ

ইন্সট্রাক্টর (গণিত)

রোল নং - ৪০

হাজীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হাজীগঞ্জ।

তত্ত্বাবধায়ক

কোর্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

২০তম বিভাগীয় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
গ্রন্থ পরিচিতি	৪
লেখক পরিচিতি	৫
ভূমিকা	৬
কাহিনী সংক্ষেপ	৭-৯
তুলনামূলক আলোচনা	৯
সমালোচনা	১০
উপসংহার	১১

গ্রন্থ পরিচিতি

গ্রন্থের নাম	একাত্তরের দিনগুলি
লেখকের নাম	জাহানারা বেগম
ধরন	দিনলিপি
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
প্রকাশক	সন্ধানী প্রকাশনী
মুদ্রন	কামাল প্রিন্টিং প্রেস
প্রচ্ছদ	কাইয়ুম চৌধুরী
পৃষ্ঠা সংখ্যা	২৭০
মূল্য	তিনশত টাকা মাত্র

লেখক পরিচিতি

জাহানারা ইমাম (৩ মে ১৯২৯ – ২৬ জুন ১৯৯৪) ছিলেন একজন বাংলাদেশী লেখিকা, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। তিনি ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশববিদ্যালয় থেকে বি এড এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। বিখ্যাত স্থপতি শরিফুল আলম ইমাম তার স্বামী ।কর্ম জীবনে তিনি ঢাকার সিদ্ধেশবরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক,বুল্‌বুল একাডেমি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন।তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ গজকচ্ছপ, সাতটি তারার ঝিকিমিকি, অন্য জীবন, জীবন মৃত্যু, দুই মেরু, প্রবাসের দিনগুলি ও বুকের ভিতর আগুন। তবে তার বিখ্যাত গ্রন্থ একাত্তরের দিনগুলি। একাত্তরে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শফি ইমাম রুমী দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি সফল গেরিলা অপারেশনের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা রুমীর মা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। রুমীর শহীদ হওয়ার সূত্রেই তিনি শহীদ জননীর মযার্দায় ভূষিত হন। তার কর্মজীবনের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার,সবাধীনতা পদক,রোকেয়া পদক সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন মিশিগানে তিনি শেষ নিঃশবাস ত্যাগ করেন।

ভূমিকা

কোন এক মা তার আদরের সবটুকু পেলব মিশিয়ে অক্ষরের জালে বুনেছেন এক নকশী কাঁথা। যার ফোঁড়ে ফোঁড়ে রয়েছে সুচ-ফোটা যন্ত্রণা, রয়েছে মশালের জৌলুশ, বারুদের গন্ধ, মুহুর্মুহু গুলির ঝংকার। আরও রয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের প্রবঞ্চনার দগদগে ঘা,রয়েছে উদ্বিগ্ন মায়ের বিনিদ্র রাত্রিযাপনের রুদ্ধশবাস বয়ান।

ব্যক্তিগত দিনলিপি বা ডায়েরী আকারে লেখা বইটির ব্যাপ্তি ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৭ ডিসেম্বর। এতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকা শহরের অবস্থা ও গেরিলা তৎপরতার বাস্তব চিত্র। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও জীবিত সকল গেরিলাদের উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে। বইটিতে তার সন্তান শফি ইমাম রুমী অন্যতম প্রধান চরিত্র। রুমী শহীদ হওয়ায়ই জাহানারা ইমাম 'শহীদ জননী' উপাধি পান।

গ্রন্থটি শুরু হয় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়ার জাতীয় পরিষদের স্থগিতাদেশকে কেন্দ্র করে ঢাকার উত্তাল পরিস্থিতি বর্ণনার মাধ্যমে। এরপর প্রত্যেক দিনের ঢাকার পরিস্থিতি ও জনমনের অবস্থা কীভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। একে একে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাক সেনাদের তাণ্ডব এবং কীভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ঢাকা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে যায় তা জাহানারা ইমাম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছেন।

কাহিনী সংক্ষেপ

সারাদেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। বুলেটের শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠা বাংলাদেশের সাথে জাহানারা ইমামের হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। বারবার সন্তানের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। তবু ক্ষত ধরা হৃদয় নিয়ে তিনি অন্যদের প্রতি দায়িত্ব এড়াননি। নিজের মায়ের বাসায় বাজার করে দিয়ে আসা, অসুস্থ শশুরের যত্ন নেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও রসদ জোগানো সবকিছুই করেছেন দৃপ্ততায়। যোদ্ধা বন্ধুদের নিয়ে বাসায় যখন রুমী মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতো তখন জাহানারা ইমামও তাদের সাথে হয়ে ওঠতেন 'যোদ্ধা মা'।

অস্ত্র আনার কাজে ছেলেকে সাহায্য করেছিলেন জাহানারা ইমাম। নিজে গাড়ি চালিয়ে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অস্ত্র আনতে মনের সাহস হারাননি তিনি। একাত্তরের রণাঙ্গন মননে, মস্তিষ্কে তাঁকে প্রকৃত যোদ্ধায় পরিণত করেছিলো। অস্ত্র হাতে সম্মুখ সমরে না দাঁড়ালেও অস্ত্রের ছোঁয়া তাঁকে বিহ্বল করেছিলো। তাঁর ভাষায়, 'পাঁচটা স্টেনগান, একটা পিস্তল, দুটো হ্যান্ড গ্রেনেড। জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমি, শরীফ, জামী, মাসুম — চারজনের হুমড়ি খেযে বসে অস্ত্রগুলো হাত তুলে উল্টে পাল্টে দেখলাম, সেগুলোর গায়ে হাত বুলোলাম, হ্যান্ড গ্রেনেড দুটোও ছুঁয়ে দেখলাম।'

লেখিকা খুব সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানবিক নির্যাতনকে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে সেনারা যাকে যেভাবে পেয়েছে ধরে নিয়ে গিয়ে গেরিলা আক্রমণকারীদের সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। সেদিন শরীফ, রুমী, জামী, মাসুম, হাফিজসহ অসংখ্য মানুষকে

ধরে এম.পি হোস্টেলের পেছনের বাড়িতে নিয়ে সেনারা এক বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়। জাহানারা ইমাম লিখেছেন :

সে কি মার! বুকে ঘুষি। পেটে লাথি, হঠাৎ করে আচমকা পেছন থেকে ঘাড়ে রদ্দা সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে গেল, রাইফেলের বাঁট দিয়ে বুকে পিঠে গুঁতো, বেত লাঠি, বেল্ট দিয়ে মুখে, মাথায়, পিঠে শরীরের সবখানে মার, উপুড় করে শুইয়ে বুটসুদ্ধ পায়ে-উঠে দাঁড়িয়ে মাড়ানো, বিশেষ করে কনুই, কবজি, হাঁটুর গিট গুলো- থেঁতলানো।

বইটিতে তারিখ উল্লেখ করে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন-
২১ এপ্রিল, বুধবার, ১৯৭১: রুমি যুদ্ধে যাবে এ নিয়ে মা ছেলে তর্কাতর্কি হয়। রুমী মাকে বুঝিয়েই যুদ্ধে যেতে চায়। কিন্তু মায়ের কথা হলো তার কি যুদ্ধে যাবার বয়স হয়েছে? সে মাত্র আই.এস.সি. পাশ করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। আবার আমেরিকার ইলিনয় ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে ওর এডমিশন হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখ ক্লাশ শুরু হবে। তাকে আগস্টের শেষে আমেরিকা যেতে হবে। মা চাইতেন সে কয়েক মাস আগেই চলে যাক। কিন্তু ছেলে রুমী ভাবছেন অন্য কিছু-
রুমী : আম্মা দেশের এ অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়তো বড় ডিগ্রি নিয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো, কিন্তু বিবেকের ভ্রুকুটির সামনে কোনদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?

জাহানারা ইমাম : আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম, না, তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধে যা।

২৯ আগস্ট, রবিবার, ১৯৭১ : রাত বারটায় ক্যাপ্টেন কাইয়ুমের নেতৃত্বে পাক আর্মি তাদের বাড়ি ঘেরাও করে। রুমী, জামী, জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ

ইমাম, হাফিজকে ধরে নিয়ে যায়। দুদিন অত্যাচারের পর রুমী ছাড়া সবাইকে ছেড়ে দেয়। রুমী আর কখনো ফিরে আসে নি।
যে সামরিক সরকার বাংলাদেশকে রক্তাক্ত করেছে সে সরকারের কাছে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা করতে রাজি ছিলেন না জাহানারা ইমাম। সন্তান আর দেশ তার কাছে এক সূত্রে গাঁথা ছিলো। দেশের জন্য তাঁর এ ত্যাগ মহত্ত্ব আর ভালোবাসার চূড়ান্ত রূপ।

১৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৭১ : জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমাম হার্ট অ্যাটাক করলে তাকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কিন্তু ব্লাক আউট থাকায়, লাইফসেভিং মেশিন সময়মতো চালানো যায় নি। শরীফ ইমাম মৃত্যুবরণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর তাকে দাফন করা হয়।

প্রতিটি দিনের এমন নিখুঁত বর্ণনা লেখিকা তার বইয়ে দিয়েছেন যেন মনে হয় সব কিছু পাঠকের সামনে ঘটে যাচ্ছে! নিজের ছেলেকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার ২ দিন আগে স্বামীকে হারিয়েছেন কিন্তু আশা হারান নি।

তুলনামূলক আলোচনা

জাহানারা ইমামের মতো আর এক মা ছিলেন, শহীদ আজাদের মা সাফিয়া বেগম। শহীদ আজাদও একই সময়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন প্রায়। শহীদ আজাদের মায়ের সাথে বেশ সখ্য ছিল জাহানারা ইমামের। সাফিয়া বেগমকে নিয়ে লেখা আনিসুল হক এর 'মা' বইটিতে জানতে পারা যায়, যেদিন আজাদের মায়ের দাফন হয়, অসুস্থতা নিয়েও তিনি গিয়েছিলেন সেই দাফনের কাজে, গাড়িতে বসেছিলেন। সেদিন অঝোরে বৃষ্টি নেমেছিল, বোধহয় শহীদেরা এসেছিল তাদের এক মাকে শেষ বিদায় দিতে। অন্যরকম এক গন্ধে ভরেছিল সেদিন চারপাশ। সেদিনের সেই বৃষ্টিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হয়তো শেষবারের মতোই ছেলের স্পর্শ খুঁজেছিলেন।

সমালোচনা

জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' বইয়ের মূল্যায়ণ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করেছেন-

'ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তিনি দেখেছেন। কিন্তু দেখছেন দূর থেকে। যদিও এই একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত গল্প। জননীর তীব্র শোক ও বেদনার গল্প। নিজের গল্প দূর থেকে দেখতে পারেন তারাই, যারা বড় শিল্পী। গভীর আবেগকে সংযত করবার জন্য প্রয়োজন হয় একটি পাষাণ হৃদয়ের। সত্যিকার শিল্পীদের হৃদয় হয় পাথরের, নয়ত এত দুঃখকে তাঁরা কিভাবে ধারণ করবেন? জাহানারা ইমাম হৃদয়কে পাথর করে লিখলেন তাঁর ডায়রী। আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর গল্প বলে গেছেন। সেই গল্প তাঁর একার থাকেনি। কোন এক অলৌকিক উপায়ে হয়ে গেছে আমাদের সবার গল্প।' -হুমায়ূন আহমেদ।

"যে কারনে এই বই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হল১৯৭১ সালের দীর্ঘ মাসগুলোতে বাঙালিদের আশা-নিরাশা-জন্ত্রনাকে সজীব করে তুলেছে এই গ্রন্থ এবং যে পরীক্ষার তাঁরা সম্মুখীন হয়েছেন ও যে ত্যাগ তাঁরা স্বীকার করেছেন,তার গভীরে দ্রিষ্টি ফেলতে আমাদের সাহায্য করেছে।"
-বিবিসি

উপসংহার

উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত একটি পরিবারের সদস্যদের যাপিত জীবনের দিনলিপিটি সেই পরিবারকে ছাপিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে প্রতিবিম্বিত করেছে যেন। একটি পরিবারের হাসি কান্না স্বপ্ন আকাঙক্ষা যেন একটি জাতির হাসি কান্না স্বপ্ন আকাঙক্ষার প্রতিচ্ছবি। বইটিতে তাই লক্ষ্য করি, জননী বুকের কষ্ট বুকেই দাফন করে সময়ের নির্যাস তুলে রাখেন তাঁর রোজনামচায়। সে রোজনামচায় দেখা মেলে ২৫শে মার্চের বর্বরোচিত হামলার পরেও কিভাবে বাঙালি ঘুরে দাঁড়াল, শোক কিভাবে তাদের হৃদয়ে শক্তির বীজ বুনল। যারা বাঙালির রক্তক্ষয়ী সে সংগ্রামের ইতিহাস বক্ষে ধারন করে হতে চান সত্যাগ্রহী, তাদের জন্য 'একাত্তরের দিনগুলি' এক অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ বলে মনে হয়।